কর্মময় জীবনের অংশীদার। তিনি বিদেশ ভ্রমনকালে নারীদের দেখেছিলেন, বিদেশের সাহিত্যের স্বনির্ভর নারী চরিত্রও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সুতরাং স্বদেশ ভূখণ্ডে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সে শিক্ষার মূল্য আবার পরবর্তী বাস্তবের জগতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত কৃষ্ণভাবিনীর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়, যেখানে তিনি লিখেছেন:

> "ইংলণ্ডে প্রায় আজকাল অধিকাংশ, ভাল-মন্দ সব পুস্তকের উপন্যাসগুলিই নারীরচিত। ঐ সব স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রীদের মধ্যে বর্তমানে মিসেস্ অলিফ্যান্ট, মিস্ ব্যাডন, মিস্ ব্রাউটন প্রভৃতি কয়েকজন অতি প্রসিদ্ধ। আর মৃত মহিলা লেখিকাদের মধ্যে জর্জ এলিয়ট, মিস অস্টিন, মিসেস্ ব্রেন্ট ও মিস্ মার্টিনো অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। এই সব গ্রন্থকর্ত্রীরা উপন্যাস লিখিয়া যে কত উপার্জন করেন ও করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে হয় ত আমাদের প্রত্যয় হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় উঁচু দরের নাট্যকার বাড়িতেছে। উঁহারা এক একখানি নাটক লিখিয়া, অন্তত ১০,০০০ টাকা পাইয়া থাকেন, আর ঐ সকল উপন্যাস-লেখিকারা বৎসরে দু'খানার কম পুস্তক না লিখিয়া থাকেন না সুতরাং শুধু কলম চালাইয়া, গড়ে তাঁহাদের অন্তত ১,৫০০ টাকা মাসিক আয় হয়। ঐ সব বড় লেখিকা ছাড়া যে কত মধ্যবিত্ত ও ছোট দরের গ্রন্থকর্ত্রী আছেন, তা' বলা যায় না, তাঁহাদের নাম ও পুস্তকের গুণানুসারে, তাঁহাদের উপার্জনের তারতম্য হয়।"

সুতরাং, এ স্বপ্ন কৃষ্ণভাবিনী দেখেছেন যে, এদেশের নারীরা সুশিক্ষিত হলে কোনো না কোনোভাবে ভদ্র ও শোভন উপায়ে উপার্জন করতে পারবে। রবীন্দ্রনাথও এই মত পোষণ করতেন বলে ছোটগল্পের পরিমিত পরিসরে মৃণাল কীভাবে দিন অতিবাহিত করবে— সে চিত্র অঙ্কন বাহুল্য বলেই মনে করেছিলেন এবং ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে কল্পবিলাসিতার পরিবেশে আর পাঠকের কাছে সেই সম্ভাব্য বিবেচনা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা, পাঠকেরা আশা করতে পারি পুরী তথা উড়িষ্যার বাঙালি অধিবাসী সমাজে সুশিক্ষিতদের মতো মৃণালও সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করবে, সমাজের মান্যতা ও শ্রদ্ধা পাবে, সে লেখক হিসেবে হোক, কিংবা শিক্ষক রূপেই হোক।

আসলে, অন্দরের নারীরা সদরে এসেছে এক প্রবল ধাক্কায়, সে ধাক্কা হল দেশ বিভাজনের ধাক্কা। ওপার বাংলা থেকে আসা পরিবারগুলি যখন স্বজন-স্বভূমি চ্যুত হয়ে এ বাংলায় টিকে থাকতে চাইছিল, তখন সেই পরিবারের নারীরা তাদের যাবতীয় প্রথা কিংবা সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিয়ে নয়, চাকরি করতে চেয়েছিল। এজন্য অবশ্য তাদেরও কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। ঘরে-বাইরে উপেক্ষিত হতে হয়েছে তাদের। ঘরের মানুষ ও প্রতিবেশীদের কাছে অনেক সময় সন্দেহের যন্ত্রণা কিংবা সংস্কারের পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে আর সদরের পুরুষদের কাছে বিভিন্ন ভাবে অত্যাচারিত কিংবা লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। সেদিন নারীদের জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল', কিংবা সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি'-র মতো উপন্যাসে এবং সে সময়ের কথাসাহিত্যিকদের বিভিন্ন ছোটগল্পে আর সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় এক দশক পরে। সেইসব দিনের প্রেক্ষিতে কিংবা সেই সব রচনার সাপেক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' বিচার করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কতখানি প্রগতিপন্থী! মৃণালকে তিনি বাইরে বের করেছিলেন, বাঙালি দাম্পত্য জীবনে নারী পুরুষের প্রবল ব্যবধান মৃণাল চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছে আর নারীর মর্যাদা পদে পদে কেমনভাবে লঙ্ঘিত হয় সেই দিকটিও সে দেখিয়েছে। এর মধ্যে শিল্পের ন্যায় লঙ্ঘন করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্তযন্ত্রণা কিংবা অভিমান প্রকাশিত হয়নি, কোথাও তা উগ্র হয়েও দেখা দেয়নি, উপরন্তু পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এবং শিল্পের সীমা লঙ্ঘন না করে সৌন্দর্যে অভিষিক্ত হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র' লেখার পরেও স্ত্রী-পুরুষের ব্যবধান এবং সংসারের পীড়ন যন্ত্রণার শিকার হয়ে নারীর আত্মক্ষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত বাঙালি সমাজে প্রায় সম সময়ে দেখা গেছে আরো অনেকের ক্ষেত্রে। যেমন অমিয়বালার উদাহরণই দেওয়া যায়। সমাজের যে বাধার কথাগুলি মৃণাল উচ্চারণ করেছে, প্রায় সেই অনুরূপ স্মৃতিচারণ করেছেন আধিপত্যের শিকার অমিয়বালাও। স্বামীর সঙ্গে কয়েক মাসের মধুময় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তিনি, সে স্মৃতি তিনি যন্ত্রণাপীড়িত দিনগুলিতেও ভুলতে পারেননি। কিন্তু স্বামীর যে আচরণ তাঁকে আহত করেছিল তা হল তাঁর অবহেলা। বোঝা যায়, এ অবহেলা সেদিন তার প্রতি ছিল না, এ অবহেলা ছিল প্রথাবদ্ধ সমাজে পুরুষের নারীর প্রতি। তাই দেখি স্ত্রীর অসুখে স্বামী প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না, তাঁর আত্মীয়দের কাছে এ নিয়ে কুৎসা রটান। অমিয়বালার মনে হয়েছে, এ কোন্ পৌরুষের প্রকাশ? অমিয়বালার লেখায় ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সচেতনতা, তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তাঁর মর্যাদাবোধ। অমিয়বালা স্বামীর গৃহ থেকে চলে এসেছেন পিতৃগৃহে,

তাঁদের জীবনে যা পারেননি, এমনকি পিতা রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনে যা পারেননি ছোটগল্পকার তথা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ শিল্পে সেই না পারার জগৎকে দেখাতে চেয়েছেন বিভিন্ন রচনায় এবং নিজের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেও তো এ চিত্রই পরিলক্ষিত হয়। পিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে সুখী হতে পারেননি, শান্তি পাননি তাঁদের দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে। তিনি দেবেন্দ্রনাথের ট্রাস্টি থেকে অর্থ পাওয়ার জন্য কন্যাদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হন। অথচ ঠাকুরবাড়িতে তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা ইন্দিরার বিয়ে হয়েছে বেশ পরে। জ্যেষ্ঠ জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়— তিন জনকেই বিলাতে শিক্ষালাভ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে অর্থের যোগান দিয়েছেন, এমনকি তাঁদের পরিবারের অপরাপর সদস্যদের মাসোহারা দিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যাশিত ব্যবহার পাননি অথবা কাছেই। শরৎচন্দ্র তাঁর মতো সম্মাননীয় মানুষের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন। কন্যা রেণুকা যখন অসুস্থ, তিনি যখন তাঁকে হাজারীবাগে নিয়ে গেছেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য, সত্যেন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দিয়েছেন আশ্রম বিদ্যালয়ে অব্যক্ততার, তখন সে দায়িত্ব পালন না করে সত্যেন্দ্রনাথ গেছেন পাঞ্জাবে বেড়াতে, অসুস্থ স্ত্রীর জন্য সামান্য দায়িত্ব পালন না করেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে বিলাত পাঠালেন এবং সেখানে অ্যালোওপ্যাথি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের গুঞ্জনে স্ত্রী রেণুকা সর্বাপেক্ষা আহত হয়েছিলেন। সে বিবরণ পাওয়া যায় মীরা দেবীর আত্মকথায়। অন্য দিকে কনিষ্ঠ কন্যা মীরার দাম্পত্যজীবন নিয়ে তাঁর বিবাহের পর থেকে সারা জীবনব্যাপী বিপুলভাবে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের ব্যবহার, তাঁর চাতুর্য, মীরার প্রতি অবহেলা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন অসহায় পিতা তাঁর যন্ত্রণাকে কখনো কখনো প্রকাশও করে ফেলেছেন নানা ছলে, বিশেষত চিঠিপত্রে।

সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রগতিশীল মানুষ যখন বাঙালি নারীর জীবন ও জগতের ক্ষেত্রে বাস্তবে প্রভূত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতাকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন শিল্পে তা থেকে উত্তীর্ণ হতে চান। বাস্তবে বাঙালি দাম্পত্যজীবনে সেদিন নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ছিল অনেকখানি ব্যবধান; তার অন্যতম কারণ সেদিনের নারীদের স্বনির্ভরতার অভাব। বাঙালি মেয়েরা স্বনির্ভর হবে, তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হবে, সমস্তে পুরুষের মতো রোজগার করবে— এ ভাবনা আসতে সময় লেগেছিল অনেক দিন। এমনকি যাঁরা অনেকখানি শিক্ষিত নারী, তাঁরাও সম্পূর্ণভাবে তখন সরকরি করার কথা ভাবতে পারছেন না।

শৃঙ্খলবদ্ধ বঙ্গদেশের যন্ত্রণাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক দেশের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীন ইংলন্ডকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল স্বাধীনতার স্পৃহা। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছিলেন মননশীল প্রবন্ধ। 'শিক্ষিতা নারী', 'ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি', 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ', 'স্ত্রীলোকের কাজ ও অকাজের ব্যবস্থা' প্রভৃতি প্রবন্ধে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকদের মতো ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। অথচ তাঁর কন্যা তিলোত্তমার বিবাহে বাধা দিয়েছিলেন রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয়। তিলোত্তমার দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল 'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ। সেখানে তিনি বাবা-মায়ের প্রতি অনুযোগ করেছেন বারংবার। কীভাবে পিতৃমাতৃস্নেহহীন হয়ে যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন কাটিয়েছেন সেকথা বলেছেন সখেদে। আবার বিবাহের পর স্বামীর ভালোবাসা পাননি, প্রবল কষ্ট ও যন্ত্রণায় তিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিলেন। সেই মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার কথা লিখেছেন কবিতায়। মায়ের মতো প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হতে পারেননি, তাই স্বামীর পীড়ন সত্ত্বেও তাঁর প্রতি প্রথা মেনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। প্রবল অন্তর-দহনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মায়ের উদ্যোগে 'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ। সেখানে 'উচ্ছ্বাস' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"বিবাহ করিল যবে প্রাণেশ আমায়।
দ্বাদশ বৎসর পরে, দু একদিন বই।।
কভু বলি অবহেলি, দুই পদে দিয়ে ঠেলি
করিলে সুন্দরী মনে দুখ পাইনু।।
এ যাতনা যার মনে সহ্য কি গো হয়?"

'আক্ষেপ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে কৃষ্ণভাবিনী জীবনকে আনন্দে ভরে দিতে পারেননি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

কৃষ্ণভাবিনীর লেখা প্রবন্ধ 'সাহিত্য', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা'র সম্পাদক, তখন কৃষ্ণভাবিনীর 'শিক্ষিত নারী'র প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ বের হয়েছিল। তাছাড়া কৃষ্ণভাবিনী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের একজন সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাদের জন্য তিনি আশ্রম গড়ে তোলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণভাবিনী-দেবেন্দ্রনাথের পরিবার সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন— এই অনুমান অসঙ্গত নয়। তিলোত্তমা তাঁর জীবনে যা পারেননি, রবীন্দ্রনাথের অনন্য

করেছিলেন। দেখা যায়, উনিশ শতকেই দুটি ভিন্ন ডিসকোর্স নির্মিত হয়েছিল। এই ডিসকোর্সের একটি দিকে যেমন নতুন সময়কে বরণ করে নেওয়ার তাগিদ দেখা গিয়েছিল, তেমনি এর অন্য দিকটিতে প্রথা কিংবা সংস্কারকে সম্পূর্ণত বিসর্জন না দিয়ে প্রথাবদ্ধতাকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের গুপ্ত প্রেসের মালিক দুর্গাচরণ গুপ্তের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী যখন তীব্রভাবে প্রথামুক্তির কথা শুনিয়েছিলেন তাঁর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনবস্থা' কিংবা 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস'-এ, তখন নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী তাঁর 'নারীধর্ম' গ্রন্থে প্রথাধর্ম মান্য করার পক্ষেই অভিমত পোষণ করেছিলেন। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মধ্যে মৃণাল এবং বড় জার চরিত্রগত স্বরূপ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিস্পর্ধী বক্তব্যকে রাখেন, তখন তা উনিশ শতকের নারী প্রগতি বিষয়ে নারীদের ডিসকোর্সের প্রতীকীরূপ পেয়ে যায়। তাই দেখি, মৃণাল যেখানে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকে দেখাতে পারে, সেখানে তার বড় জা ধর্মের কারণে, পাতিব্রত্যের দোহাই দিয়ে কিংবা প্রবল সংস্কারের বশে সমস্ত কিছু মেনে নেয়।

দাম্পত্য জীবনের অংশীদার নারী পুরুষের প্রবল ব্যবধানকে কিংবা নারীর মর্যাদা লঙ্ঘনকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিচিত অনেকগুলি দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে অনুধাবন করেছিলেন। প্রথমেই বলা যায়, কৃষ্ণভাবিনী দাসের কন্যা তিলোত্তমার প্রসঙ্গ। নদীয়া জেলার অখ্যাত গ্রাম কাজলায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম কৃষ্ণভাবিনীর। তাঁর বিয়ে হয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। দেবেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু এবং হাইকোর্টের উকিল। দেবেন্দ্রনাথের অন্য ভাই উপেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথও ছিলেন বিশেষভাবে খ্যাত। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন নাট্যরচয়িতা, নাট্য-পরিচালক ও প্রযোজক। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের জন্যই নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল চালু করেন তৎকালীন ইংরেজ সরকার। অন্যদিকে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন সমাজ সংস্কারক এবং পিতার মতোই হাইকোর্টের উকিল। পিতা শ্রীনাথ বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু নিজের পুত্র উপেন্দ্রনাথ যখন বিধবা নারীকে বিয়ে করেন, তখন তিনি তাঁকে মেনে নিতে পারেননি। এমনকি অপর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ যখন ইংলন্ড গমন করেন, তখন তিনি তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী যখন স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ড গমন করেন, তখন অবশ্য তাঁদের শিশুকন্যা তিলোত্তমাকে নিজের কাছে রেখে দেন শ্রীনাথ। তিলোত্তমার বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছর। কৃষ্ণভাবিনী 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা'র মতো গ্রন্থ লিখেছেন, সেখানে প্রকাশ করেছেন নারী প্রগতি সম্পর্কিত তাঁর চিন্তারাজি। ইংলন্ডে থাকাকালে সেদেশে পাশ্চাত্য নারীদের জীবনচর্চাকে প্রত্যক্ষ করে এদেশের

না দ্বিতীয় 'দেনাপাওনা', অর্থাৎ সে গল্পের আর পুনরাবৃত্তি করলেন না। বাস্তবের জগৎ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিল্পী-মনের জারক রস মিশিয়ে সংগুপ্ত শক্তি (occult power)-র সাহায্যে তিনি যে গল্প রচনা করলেন তা 'দেনাপাওনা'-র জগৎ থেকে কত দূরবর্তী। 'দেনাপাওনা'র অভিমানী নারী নিরুপমা নয়, পেলাম 'স্ত্রীর পত্র'-এর প্রতিবাদদৃপ্ত নারী মৃণালকে। এক্ষেত্রে স্নেহলতার মৃত্যুর অনুষঙ্গটিকে কেবলমাত্র বিন্দুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দ্যোতিত করলেন। কিন্তু সেখানে মূলত পণপ্রথার ব্যাপারটিকে আলোকিত করলেন না। বরং দেখালেন, আধিপত্যের ধরন কত রকমের হতে পারে! আধিপত্যাধীনের অবমাননার মূল কোথায়। 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমারা কোন্ শক্তিতে কী অর্জন করতে চায়!

এদিক দিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের আবেদন বহুমাত্রিক। আসলে, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। কেবলমাত্র স্নেহলতার ঘটনাটিই তাঁকে আলোড়িত করেনি, বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে অবনমিতের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ তাঁকে বারবার দেখতে হয়েছিল। নারীর সঙ্কুচিত অবস্থান, পদে পদে তার মর্যাদার অবমাননা, দাম্পত্য জীবনে নিহিত বৈকল্য, সবমিলিয়ে তার যন্ত্রণাদগ্ধ অবস্থান বিষয়টি তাঁর পরিচিত জীবনে দেখেছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে পরিচিত এমন পরিবারগুলিতে নারীর জীবনের বেদনাবিধুরতাকে কখনো তিনি অনুভব করেছিলেন, কখনো নিজের বাড়িতেই পিতা হিসাবে কন্যার ম্লানচিত্তকে উপলব্ধি করেছিলেন। কবির 'মনোভূমি' বাস্তবের তথ্যভূমি অপেক্ষা অধিকতর সত্য। তাই এ ধরনের ঘটনা থেকে 'স্ত্রীর পত্র'-এর মতো যে গল্প তিনি লিখলেন, তা অনেক বেশি জোরালো, অনেক বেশি আবেদনঋদ্ধ। কেননা, এ গল্প লেখার পরেও গল্পের জগতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বাস্তবে ঘটেছে বারবার।

চার

উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বহুমাত্রিকভাবে আলোড়িত হয়েছিল। বাইরের প্রবল হাওয়া এ যুগের ইংরেজি শিক্ষিত নতুন যুবকদের আলোড়িত করেছিল। ফলত, সেই সব যুবকেরা যখন পিতা হলেন, কিংবা স্বামী হলেন তখন বহুবিধভাবে বদ্ধমূল প্রথাকে উপেক্ষা করে অন্দরের নারীদের নিয়ে আসতে চাইলেন সদরে, কিংবা প্রগতিশীল মানুষেরাও নানাভাবে মেয়েদের শিক্ষিত করতে সচেষ্ট হলেন, যে সমস্ত সংস্কার নারীদের পীড়িত করে সেগুলির বিরুদ্ধাচরণ করলেন। এই সময়ের নারীদের স্মৃতিকথা, আত্মকথা, আত্মজীবনী, ব্যক্তিগত কথা তথা জবানবন্দিগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তারা সেই সময়কে কীভাবে গ্রহণ

'প্রজাপতি' কিংবা 'কায়স্থ' পত্রিকার তরফ থেকে এ ধরনের প্রতিবেদন সে সময় বারবার লেখা হয়েছিল। তাছাড়া সচেতন সামাজিকদের পক্ষ থেকে অনেকেই লিখেছিলেন প্রবন্ধ এবং কবিতা। রসিকলাল রায়ের 'সমাজ সমস্যা', যদুনাথ চক্রবর্তীর 'বিবাহ পণে বালিকার আত্মবলি', ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'বাল্যবিবাহ ও বরপণ', অশ্বিনীশঙ্কর চৌধুরীর 'হিন্দু সমাজের পণপ্রথা', অখিলচন্দ্র পালিতের 'বরপণ সম্বন্ধে চিন্তা', কেশবচন্দ্র নাগের 'পণপ্রথার পরিণাম' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে দ্য মর্ডান রিভিউ-এর মতো বিভিন্ন পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। বিভিন্ন স্থানে পণপ্রথা বিরোধী সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের 'প্রজাপতি' পত্রিকা থেকে যশোরে অনুষ্ঠিত এ ধরনের সভার প্রতিবেদন বের হয়েছিল। এছাড়াও গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি বিবাহযোগ্য বালিকার উক্তি', প্রমথ চৌধুরীর 'স্নেহলতা', করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্নেহলতা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মৃত্যু স্বয়ম্বর', প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্তের 'স্নেহলতা', নীহারের 'স্নেহলতার বিদায়' প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে স্নেহলতার মৃত্যুর প্রতিবাদদীপ্তিকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কয়েকটি চরণ সেকালে রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছিল। কবিতার প্রথম স্তবকে পরিস্ফুট হয়েছিল সোচ্চার প্রতিবাদ এবং জ্বালাময় উচ্চারণ, যা জনসমাজকে আলোড়িত করেছিল:

"বাবা! থাকুক আমার বিয়ে,
চাইনে আমি এম,এ বি,এ কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে,
ছাগল গরুর মত যাদের, ছেলের হাটে গিয়ে,
সোনার চেইন-সোনার ঘড়ি, গর্ব্বে যাদের গলায় পড়ি,
অমন পশু কিনো নাক কাণা কড়ি দিয়ে!"

উল্লেখ্য, এই সমস্ত লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২০ বঙ্গাব্দে। সুতরাং দেশ ও কাল সম্পর্কে সদা জাগর, হৃদয়বান ব্যক্তিত্ব, উদার-নৈর্ব্যক্তিক জীবন মূল্যবোধের অধিকারী এবং সংবেদনশীল মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে এ ঘটনার অভিঘাত ও মর্মান্তিকতা এবং তজ্জনিত মানবিক প্রতিবাদের উত্তাপ স্পর্শ করবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, যে-রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন : "কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো"—তা কেমনভাবে যথার্থ সত্য হয়ে ওঠে। তাই দেখি, তিনি স্নেহলতার মৃত্যুর কত আগে 'দেনাপাওনা' গল্প লিখেছিলেন!

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের তথ্যকে কীভাবে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করতে হয় এ সম্পর্কে ছিলেন প্রখরভাবে সচেতন। তাই তিনি এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় লিখলেন

সঞ্জীবনী মহিলাতে আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে:

> "সমাজ যদি জীবিত থাকিত, তবে আজ প্রলয়কারী গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। আজ এক পক্ষকাল হইল, বালিকা বলি হইয়াছে, ইহার মধ্যে জনসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত—বঙ্গদেশের ৪ কোটি নরনারী ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত "আজ হইতে বরপণ উঠিয়া গেল।"

১৩২০ বঙ্গাব্দে ১০ম সংখ্যা ৯ম ভাগের 'ভারত মহিলা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> "স্নেহলতার শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে আমরা আমাদিগের তরুণী ভগিনীদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, আমাদের একটী ভগিনীর এই প্রকার জীবনদানেও যদি কাপুরুষদিগের চৈতন্য না হয় তবে আর কেহ আগুনে পুড়িয়া মরিও না, এই পশুদের পশুত্ব তাহাতে ঘুচিবে না, বিধাতা প্রদত্ত এই অমূল্য জীবন নরপশুদিগের পাপক্ষয়ের জন্য তোমরা কেন পুনঃ পুনঃ বিসর্জ্জন করিবে?"

ফাল্গুন ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিতদের উদ্দেশে বলা হয়:

> "যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা মান সম্পদাদি আর কিছুর প্রতি দৃকপাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গের সমুদয় সম্পাদককে হয়রান করিয়া ফেলেন, আর বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপ মাকে পণ লইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কী?"

'প্রবাসী' পত্রিকায় পরের সংখ্যায় অর্থাৎ চৈত্র ১৩২০ বঙ্গাব্দে স্নেহলতার মৃত্যু-সংক্রান্ত ঘটনায় যখন আধিপত্যকামী সমাজের কর্ণধারেরা ব্যথিত না হয়ে বাল্যবিবাহের পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হলে তারা মা-বাবার দুঃখ যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবে না, সুতরাং এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না, তখন তার প্রতিবাদ করে লেখা হয়েছিল:

> "যেন দুর্ঘটনা ঘটাটাই একমাত্র দুঃখের বিষয়; যে জঘন্য সামাজিক রীতির জন্য লোকে সর্বস্বান্ত হইতেছে, বৈবাহিকে বৈবাহিকে মনান্তর ঘটিতেছে, দায়ে পড়িয়া পণ দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিবার জন্য বা এড়াইবার জন্য লোকে প্রতারণা করিতেছে, বালিকারা আত্মঘাতী হইতেছে, সেই রীতিটাই যেন ঘোর পরিতাপের বিষয় নয়। তাছাড়া বাপমায়ের টাকার যোগাড় হয় না বলিয়াই তো অনেকস্থলে অবিবাহিতা কন্যার বয়স বাড়িয়া চলিতে থাকে। ফোঁড়া হইলে যদি কোন ডাক্তার তাহা ঢাকিয়া রাখিতে বলে, কিন্তু রোগ বিনাশ করিবার কোন চেষ্টা করে না, তাহার ব্যবহার যে রূপ, এই যুক্তির স্রষ্টাদের আচরণও তদ্রূপ।"

লেখার সাত বছর পরে (১৯০০) স্নেহলতার জন্ম। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং থানার কাগদি বা কাগরি গ্রামে হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা স্নেহলতা জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামবাজারের ৪৩/১ রাজবল্লভ স্ট্রিটে হরেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে বাস করছিলেন স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর আগে থেকেই। স্নেহলতার চৌদ্দ বছর বয়স হলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হরেন্দ্রনাথ জনৈক মুখোপাধ্যায় বংশের একটি বি.এ. পাশ পাত্রের সন্ধান পান। পাত্রপক্ষ হাতেহাতে নয়শ টাকা এবং বারোশ টাকার অলঙ্কার বরপণ হিসাবে দাবি করেন। কিন্তু প্রায় দু'হাজার টাকার পণ দেওয়ার সামর্থ্য কন্যা-পিতা হরেন্দ্রনাথের ছিল না, আবার এই রকম বি.এ.বি.এল. পাত্র অর্থাৎ কলেজি পাশ কেতাবি ডিগ্রিধারি তথাকথিত শিক্ষিত পাত্র হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না স্নেহলতার পিতা। ফলত বাড়িঘর বন্ধক রেখে তিনি যাবতীয় টাকা সংগ্রহে উদ্যোগী হন এবং নিকটবর্তী ১৪ ফাল্গুন বিবাহের দিন স্থির করেন।

কিন্তু মর্যাদাবোধ সম্পন্ন নারী স্নেহলতা পাত্রপক্ষের এই অন্যায্য দাবিতে এবং পিতার অক্ষমতায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাঁর বিবাহের কারণে তাঁর পিতা শেষ সম্বল বাড়িটুকু হারাবেন একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। 'দেনাপাওনা' গল্পে পিতা রামসুন্দর বরপণ বাকি রাখলে বিবাহের পর নিরুপমাকেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আত্মমর্যাদা বিসর্জন না দিয়ে সে পিতাকে তখন বলেছিল যে, কিছুতেই তার শ্বশুরকে টাকা দেওয়া যাবে না, কারণ সে কেবল 'টাকার থলি' নয়।

নিরুপমার কাহিনি স্নেহলতা শুনেছিল কিনা সে তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে স্নেহলতা প্রথাগত শিক্ষায় ডিগ্রিধারী না হলেও নিজ গৃহে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন স্বশিক্ষিত। তাই পিতাকে আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে বেছে নিয়েছিলেন অপরাহ্ণের নির্জন ছাদ, কেরোসিন তেল, দেশলাই বাক্স আর পরিধানের বস্ত্র। কেরোসিন-সিক্ত বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি। বাঙালি সমাজে প্রথাবদ্ধ জীবনে পীড়নের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই ঘটনায় সেদিনের শিক্ষিত সমাজ কেবল উদ্বিগ্ন মাত্র হয়নি, তাঁদের আলোড়ন প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্নভাবে। একদিকে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন প্রচলিত বরপণ প্রথার অন্তরালে নিহিত নিষ্ঠুরতাকে দেখানো হয়েছিল, অন্যদিকে প্রগতিশীল লেখকেরা তথাকথিত শিক্ষিত পাত্রপক্ষের মনোভঙ্গির প্রতি চরম বিদ্রূপ এবং পথপ্রথার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া নিষ্পাপ নারীর প্রতি তীব্র সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অনেকগুলি পত্রিকায় স্নেহলতা সংক্রান্ত ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েছে। তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হল—

"গুরুদেব কথা প্রসঙ্গে বলিলেন "এ বিষয়ে বাঙ্গালী সমাজ অন্ধহীন। স্ত্রী শক্তি বাংলায় এখনো সুপ্ত। ভারতের নবযুগে নারীশক্তির আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। না হয় তো জাতীয় জীবন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। সে জন্য এ অঞ্চলে নারী লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী শোনা যায় না, তাহারা আশৈশব মুক্ত হাওয়ায় মানুষ হইয়া বীর শক্তির দ্বারা সমাজে নিজ স্থান অধিকার করিয়া পুরুষের নিকট প্রাপ্য সম্মান আদায় করিয়া লইতেছে।"

'নারী লাঞ্ছনার অমানুষিক কাহিনী' বঙ্গসমাজে তিনি শুনে এসেছেন বারবারই। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে তিনি এমন কথা বলেছেন যার ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি এমনই একটি নারী নিষ্পেষণের শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বঙ্গসমাজেই, যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পেও আছে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্প লেখা হয়েছে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে। এই গল্পে বিনু কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মারা গেলে বাড়ির পুরুষ-কর্তারা উপহাস করেছিল, যা শুনে মৃণাল বলেছিল : "কিন্তু নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।" মৃণালের বক্তব্য যে সঠিক, সে প্রমাণ পাওয়া যায়, বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা' অংশের 'ভগিনীর পত্র'-এ। আগেই বলা হয়েছে, বিপিনচন্দ্রের লেখায় রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর বিপরীত ডিসকোর্স নির্মাণ করা হয়েছে। তবুও সেই ডিসকোর্সের মধ্যে লেখকের বক্তব্যের অন্তরালেও রয়ে গেছে কিছু বাস্তব সত্য। তাই প্রতিস্পর্ধী বীক্ষার অধিকারী হয়েও অগোচরে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেই যেন সমর্থন করে ফেলেছেন। তাই দেখি, সেখানে বারবার স্নেহলতার উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'স্নেহলতা ঘুরিটার কথা'। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি স্নেহলতা কাপড়ে আগুন দিয়ে মারা যায় এবং তার মৃত্যু তৎকালীন বাঙালি সমাজের শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন তুলেছিল তা অন্য কোনো নারীর আত্মহত্যা বা লাঞ্ছনার ক্ষেত্রে ঘটেনি। একজন মহৎ লেখকের অতুলনীয় প্রতিভা উপলব্ধি করা যায়, তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিফলিত লেখকের জীবনভাবনা আর পরবর্তী সমাজ জীবনে ঘটমান সত্যকে মিলিয়ে পড়লে। যে রবীন্দ্রনাথ একদা 'দেনাপাওনা' (১৮৯৩) গল্পে দেখিয়েছিলেন নিরুপমার বেদনার্ত চিত্রের কথা, তাই তো ঘটে যায় একুশ বছর পরে (১৯১৪) স্নেহলতার ক্ষেত্রে। 'দেনাপাওনা'য় নিরুপমা নিজেকে 'টাকার থলি' বলে মনে করতে পারেনি, তার বাবার অপমান সে সহ্য করতে পারেনি, ফলত সে তার পিতাকে দিয়ে শ্বশুরকে টাকা দেওয়ায়নি। পরিণামে সে আত্মহনন করেছে, শীতের দিনে উত্তরের জানালা খুলে দিয়ে অসুস্থ হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। 'দেনাপাওনা' গল্প

রবীন্দ্রনাথের ভাবার মতো একথা যেমন বলেছেন, তেমনি মৃণালের ভাই শরতের পোশাক পরিচ্ছদ তাঁর মতো—এ উল্লেখও করেছেন। শুধু তাই নয়, মৃণালের কবিতা সম্পর্কে এমনভাবে কটাক্ষ করেছেন যে, মনে হয় সাহিত্য বিষয়ে রচয়িতার উন্নাসিকতা স্পষ্ট। তাই দেখি, প্রায় জেদের মতোই কবিদের সম্পর্কেই তিনি ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু প্রভূত বিদূষণ ও ব্যঙ্গ-কটাক্ষ সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র'-এ যে সত্য প্রকাশে সচেষ্ট, তাকেই স্বীকার করেছেন। বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন : বিন্দু নয়, বিন্দুর মতো একটি মেয়ে পাশের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে, বিন্দু তা দেখে অভিভূত হয়েছে ও জ্ঞান হারিয়েছে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল যে বলেছে, দেশসুদ্ধ মেয়েদের কাপড়ে কেন আগুন লাগে, পুরুষের কোঁচায় কেন লাগে না— একথা যুক্তিসিদ্ধ হয়ে যায়। আবার, স্নেহলতার আগুনে পুড়ে মরার বিবরণটি নিয়ে যতই কৌতুক-কটাক্ষ করুন না কেন বিপিনচন্দ্র, তার সুইসাইড নোট যারই লেখা তিনি করতে চান না কেন, স্নেহলতা ও বিন্দুর শ্বশুরবাড়ির পাশের গলির বাড়ির মেয়ের মৃত্যু— উপর্যুপরি দুটি মেয়ের আত্মহত্যার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

আবার নরেন মেজ বৌকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে এবং সে বিবরণের মধ্য দিয়ে বিপিনচন্দ্র মেজদাদা-বৌদি অর্থাৎ মৃণালের শ্বশুরবাড়ির সহৃদয়তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কবিভাবেই হোক, কিংবা যে কোনো ছলনাতেই হোক পুরুষেরা মেয়েদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করত। সুতরাং, বিপিনচন্দ্র যতই কেন না, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে আক্রমণে সচেষ্ট হন, তাঁর লেখার শৈল্পিক দুর্বলতা প্রকট, তেমনি বস্তুতও ব্যক্তিগত বিদ্বেষকে তিনি অতিক্রম করতে পারেননি, তাতে গভীরতার অভাব স্পষ্ট। উপরন্তু প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সিত সত্য স্বীকার করেছেন বিপিনচন্দ্র—সমনস্ক পাঠক মাত্রেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

তিন

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে, রবিবার বিদেশযাত্রা কালে তৎকালের বোম্বাই উপকূলে অবস্থানের সময় সেখানকার সমুদ্রসৈকত এলাকাগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের নিঃসংকোচ মেলামেশায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার বহির্জীবনে নারীদের অনুপস্থিতিজনিত অসম্পূর্ণ জীবনের কথা মনে করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। সে যাত্রার সঙ্গী মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার সন্তান সোমেন্দ্রচন্দ্র তাঁর 'রবীন্দ্র-সঙ্গমে য়ুরোপ প্রবাসের স্মৃতিকথা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছেন :

পুরীতে থাকার সময় নেজ বৌয়ের সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ করার পরই সে তার বউদিদিকে লিখেছে—"তোমার নেজ বউ-এর ডায়রীও ঠিক এই।" নেজ বৌয়ের ডায়ারির সমরূপতা সম্পর্কে সে জ্ঞাত হল কী করে? আবার, সেই ডায়ারির বক্তব্য আর পরবর্তীকালের কার্যকারার পার্থক্যও লক্ষ করার মতো। বাড়িতে থাওয়া আর সমুদ্রে নুলিয়ার কাছে সাঁতার কাটা— নেজ বৌয়ের এই কাজের পরিচয় পরে তো সে আর দেয়নি। সে যখন নেজ বৌয়ের কাছে কয়েকদিন থাকল, তখন সে তার কবিতা পড়া আর শব্দ চয়ন করে লিখে রাখা এবং তা দিয়ে নিজের কবিতা তৈরি করার কথাই লিখেছে। তাহলে কোনটি ঠিক? না কি, কটাক্ষ করতে গিয়ে চরিত্র এবং তার স্রষ্টা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন!

তৃতীয়ত, মৃণালের ননদ কোথা থেকে এল? এ চরিত্র কল্পনা করার হেতু কী? বিশেষত, মৃণাল যখন তার উল্লেখ মাত্র করেনি। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল তার স্বামীকে বলেছে: তোমরা জান না যে আমি কবিতা লিখি, আজ পনেরো বছর ধরে সে পরিচয় গোপন আছে। অথচ তার ননদ বলে যে, সে কবিতা লেখে, সেই কবিতা সে পড়েছে। এমনকি সে এও মনে করেছে যে, বাড়িতে সেই কবিতা মৃণাল ফেলে গেছে। এমন একজন দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল ননদ, এমনকি বাড়ির একমাত্র পাঠক পাওয়া সত্ত্বেও 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল তার নাম উল্লেখ করেনি। অথচ, বিপিনচন্দ্র মৃণালের ননদ চরিত্র কল্পনা করলেন, সেই ননদ তার দাদাকে চিঠি দিয়ে নেজ বৌয়ের কোনো বিপদ ঘটবে না—এই অভয় দেয়—এ সমস্তও চিত্রিত করলেন। সবমিলিয়ে এক ধরনের কষ্টকল্পনা করলেন।

চতুর্থত, বিন্দু কেন শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে এবং পুনরায় ফিরে গেছে এ কৈফিয়ৎ বড় বেশি জোড়াতালি দেওয়া। বিন্দু শুভদৃষ্টির সময় চোখ বন্ধ করে ছিল, সে না হয় মেনে নেওয়া যায়; কিন্তু স্বামীর আচরণের যে ব্যাখ্যা সে দিয়েছে, তা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। বাসর ঘরে তার স্বামী কাচের বাসন ভেঙে চুরমার করে দেয়, কিংবা জুতো পায়ে লাথি মেরে ভাতের থালা ও হেঁসেল লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আবার সাতাশ নং মাখন বড়াল লেনের বাড়ি কিংবা খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় না পেয়ে বাধ্য হয়ে বিন্দু শ্বশুরবাড়ি যায় এবং সেখানে তার স্বামী যেভাবে প্রেমানুরাগ প্রকাশ করে —তা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, বিপিনচন্দ্রের 'মৃণালের কথা'য় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র-বিদূষণ। বিপিনচন্দ্রের বক্তব্যেও নারীর শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র বারংবার রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করেছেন, এমনকি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেছেন। তিনি নেজদাদাকে লেখা ভগিনীর পত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতেও দ্বিধান্বিত হননি। আবার মৃণালের চিঠির ভাষা

কেবলমাত্র একখানি চিঠি লিখেছে। নরেনের কাছে একথা শুনে মেজ বৌয়ের জ্বর ছেড়ে গেল, অর্থাৎ মেজ বৌয়ের যেন গভীর চিন্তার অবসান ঘটল।

মেজ বৌ বিন্দুর কারণে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল। নরেন জানিয়েছে, বিন্দুর আসলে মৃত্যু হয়নি। বিন্দু পরম শান্তিতে সংসার করছে। বিন্দু একদা যে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিল তা মেজ বৌয়ের কারণে। মেজ বৌ তার মনে এই ভাব জাগিয়েছে যে, বিন্দু নির্যাতিত ও নিপীড়িত। নরেনের মতে যে নিজেকে নিপীড়িত মনে করে তার পক্ষে দ্রোহ অনিবার্য। সুতরাং বিন্দুর চলে আসার জন্য দায়ি মেজবৌ।

'শ্রীচরণেষু দিদি' সম্বোধন করে মৃণালকে চিঠি লিখে বিন্দু জানিয়েছে যে, সে মরেনি, মরার কোনো ইচ্ছেও তার নেই। বিয়ের আগে সে ধরেই নিয়েছিল যে, সে যেহেতু কুৎসিত দেখতে, তাই তাকে যে বিয়ে করতে চায় নিশ্চয়ই তার কোনো গলদ আছে। তাই শুভদৃষ্টির সময়ে ও বাসর ঘরে ভূতের ভয়ে যেমন চোখ বন্ধ করে থাকে ছোট ছেলেরা, তেমন করেই সে কোনোক্রমে রাতটি কাটিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পেয়ে সে যখন স্বামীর কাছে গেল, তখন সে তার স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ হল। সুতরাং সে বড় সুখে আছে।

অর্থাৎ বিপিনচন্দ্র তাঁর 'মৃণালের কথা' গল্পে দেখাতে চেয়েছেন : প্রথমত, মৃণালের বেরিয়ে আসার কোনো হেতু নেই। দ্বিতীয়ত, সে কবিভাবে পূর্ণ এবং কবিরা যেহেতু অদ্ভুত আচরণ করে, সুতরাং তার ব্যবহারও উদ্ভট। তৃতীয়ত, মেজ বৌয়ের মতো মেয়েরা স্বামীকে মান্য না করে বিপদেই পড়ে, মৃণালও পড়েছে। চতুর্থত, বিন্দু আদৌ মরেনি, মরেছে অন্য গলির অন্য বাড়ির কোনো মেয়ে। মৃণাল বলেছে, প্রধানত, সে বিন্দুর কারণেই শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেছে। সুতরাং তার এই বেরিয়ে আসার ভিত্তিটিও অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃণাল ভুল করে চলে এসেছে এবং অচিরেই সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

বিপিনচন্দ্রের এ জাতীয় প্রতি-যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য সে বিচার করার আগে গল্পের বিন্যাসগত কিছু ত্রুটি ও অনৌচিত্য দোষের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, শরৎ আর নরেন কলকাতায় YMCA-এর বোর্ডিংয়ে একত্রে থাকত। পুরীতে তাদের দেখা হলে কিছুতেই নরেনকে শরৎ ছাড়েনি, বাড়িতে নিয়ে গেছে এবং মেজ বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। অথচ আশ্চর্য লাগে যে, কেন শরৎ এর আগে বোর্ডিংয়ে দিদির প্রসঙ্গ নরেনের কাছে বলেনি, কিংবা দিদির বাড়ি নরেনকে নিয়ে যায়নি। নরেন কটক থেকে পুরীতে তার প্রিয় বৌদিদির কথা শুনে গোয়েন্দাগিরি করতে গেছে, অথচ এর আগে কলকাতায় থাকার সময় তার সেই প্রিয় বৌদিদির বাড়ি দেখেনি, কিংবা মেজ বৌয়ের সঙ্গে পরিচয় করেনি—এই কার্যকারণবোধের অভাব বড় বিস্ময় তৈরি করে। দ্বিতীয়ত,